অপরাজিতার হাসি

সৌমিত্র বসু

একটি বছর সতের'র ছেলেকে মনে পড়ছে। কলেজে পড়ে, কিন্তু যথেষ্ট চালাক চতুর নয়, একটু হাঁ করা ধরনের। বহুরূপী 'অপরাজিতা' করতে যাবে শিলচরে, সে যাচ্ছে মঞ্চ নির্মাণের দায়িত্ব নিয়ে । জীবনে প্রথম প্লেনে চড়া। জানলার একেবারে ধারে তৃপ্তি মিত্রের আসন, তাঁর পাশে তার । ছেলেটির দিকে রমজার চোখে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'তুই জ ানলার ধারে বসবি তো?' মনে পড়ে, তৃপ্তি মিত্রের বই পড়ায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে উচ্ছ্বসিত ছেলেটি বারবার নিজের রোমাঞ্চ ভাগ করে নিতে চাইছিল তাঁর সঙ্গে। প্লেনে একদিন আগে কলকাতায় ফিরে তিনি নিজে থেকে ছেলেটির মাকে ফোন করে জানিয়েছিলেন প্রথম বিমান ভ্রমণ কতটাই মুগ্ধ করেছিল সৌমিত্রকে।

এই ছিলেন তৃপ্তি মিত্র। এতটাই সহজ,মঞ্চের বাইরে প্রতিভা বা বোধের দ্যুতিকে এমনভাবে লুকিয়ে ফেলতে প ারতেন যে অতি সাধারণ মা মাসির থেকে কোথাও তাঁকে আলাদা করার কথা মনেই হত না। চোখ বুঁজলে টুকরো টুকরো ছবি মনের মধ্যে জেগে ওঠে। হো হো করে হাসছেন (কোন মহিলার অমন আগল খোলা হাসি আর শুনেছি বলে মনে পড়ে না)। ঠাট্টার জবাব দিতে না পেরে খোলা চুলে চিনী হাতে ছুটে যাচ্ছেন রমাপ্রসাদের দিকে (ওঁকে খ্যাপ ানোর ব্যাপারে রমার কোন জুড়ি ছিল না)। লুকিয়ে লুকিয়ে জর্দা দেওয়া পান খাচ্ছেন ('গঙ্গাদা যে কি নেশা ধরিয়ে দিলেন !)। শাঁওলী ঘরে ঢুকে পড়লে প্রাণপণে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছেন এবং ধরা পড়ে একহাত জিভ কাটছেন — এই সব ছবি। স্বভাবের এই সারল্যকে আবার তিনি অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারতেন, আমার মতে, তৃপ্তি মিত্রের আসল জোর ছিল এইখানে।

বুঝতে পারছি, এই ধরনের মন্তব্য খুব একপেশে কোন সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যেতে পারে। 'বিসর্জনে' গুনবতী আ মি দেখিনি, কিন্তু 'রাজা' নাটকের সুদর্শনায় যে অপরিমেয় দম্ভ প্রকাশ পেত চাপা ঠোঁটে, ভু ও চিবুক তুলে অবজ্ঞার ভঙ্গি তে তাকানোয়, য়োকাস্তে চরিত্রে অয়দিপাউসকে বোঝানোর সময় একটু খাদের গলায় যে অভিজ্ঞতার ক্লান্তি আনতেন — নিছক মা-মাসি প্রতিম সরলতা তার থৈ পাবে না। কিন্তু যাঁরা মন দিয়ে এইসব অভিনয় দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন চরিত্রের এই নানা স্তর চলে আসত অতি অনায়াসে, কোন চেষ্টা বা পরিশ্রম এর পেছনে আছে বলেই মনে হত ন া— অন্তত ঃ সেই অনায়াস জায়গাগুলোই মনে পড়ে আমার।

শম্ভু মিত্র নিজের সম্পর্কে কোথাও বলেছেন, খুব বড়ো মাপের চরিত্রেই তাঁর অভিনয় স্ফূর্তি পায় বেশি। আমার বিশ্বাস, তৃপ্তি মিত্রের শ্রেষ্ঠ কাজ তাঁর অনভিজাত চরিত্রগুলোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন রক্তকরবীর নন্দিনী, পুতুল খেল ার বুলু, চার অধ্যায়ে এলা, বাকি ইতিহাসে কণা ও বাসন্তী এবং অবশ্যই অপরাজিতা। ছেঁড়া তার আমি দেখিনি, শুনেছি গ্রাম্য আবহটি অসম্ভব দক্ষতায় নিয়ে আসতেন। কেন অত ভাল লাগত এইসব চরিত্রের অভিনয় ? আজ মনে হচ্ছে, খুব সাদা পরিষ্কার কাপড়ে যেমন যে কোন রঙের আলো ফেললেই তা অলৌকিক বর্ণময় হয়ে ওঠে তৃপ্তি মিত্রের কণ্ঠ এবং শরীর যে কোন আবেগকেই তেমনি তার সম্পূর্ণ তীব্রতা নিয়ে প্রকাশ করতে পারত। ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা, নানারকম চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কই তো নানারকম আবেগের জন্ম দেয়। এই বিভাজনটি খুব স্পষ্ট করে তৈরী করতে পারতেন তিনি। যেমন, রক্তকরবীতে নন্দিনীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হয় রাজার, বিশুর কিশোরের, সর্দারের, ফাগুলালের , অধ্যাপকের ইত্যাদি ইত্য াদি। সম্পর্কগুলো মূলতঃ ভালোবাসার, কিন্তু বিচিত্র স্তরে তা বিচিত্র রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। বুলুর সঙ্গে তপন, ডাক্তার, কৃষ্ণা বা তার সন্তানেরা আলাদা আলাদা সম্পর্কে যুক্ত। একজনের কাছে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কের অনেকখানিই অন্ধক

ারে ঢাকা। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনের মতই আর কি ।

আজ এইসব চরিত্রগুলোকে যখন একসঙ্গে দেখতে বসি, তখন এদের মধ্যে হয়তো একটা সাধারণ মিল খুঁজে প াই। এরা সকলেই বোধহয় খুব সহজ বিশ্বাসের লাবণ্যে দেখতে চেয়েছে জীবনকে। শেষ পর্য্যন্ত পারেনি - রঞ্জন বা কিশে ারের মৃত্যু দেখতে হয়েছে নন্দিনীকে, বুলু বা এলার সামনেও তার ভালবাসার জগত ধীরে ধীরে রঙ পাল্টেছে, কিন্তু চরিত্রের আন্তর সেই সহজতাই তাদেরঠেলে দিয়েছে এমন কোন সিদ্ধান্তের দিকে, আমরা কৌশলী সংসারী লোকেরা যা চট করে নিতে পারব না। তৃপ্তি মিত্র নিজেকে, নিজের স্বভাবকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রয়োগ করেছেন এইসব চরিত্রে।

একটা দুটো অভিনয় দর্শনের অভিজ্ঞতা বলি। ক্লাস এইটে পড়বার সময় দেখেছিলাম, 'বাকি ইতিহাস' । তৃপ্তি মিত্র এখানে তিনটে চরিত্রে অভিনয় করতেন। তিনটি চরিত্র তিনরকম করে করতেন বললে কিছুই বলা হয় না। এক মধ্যবয়স্কা লেখিকা, অধ্যাপকের স্ত্রী এবং একই দম্পতিকে নিয়ে লেখা দুটি আলাদা গল্পের নারী চরিত্র। আমি মুগ্ধ হয়ে দেতাম অধ্যাপকের লেখা গল্পের কণাকে। স্বামীর সাহচর্য বঞ্চিত, ভার টেনে চলা এক ম্লান মেয়ে। কি কণ ক্লান্ত চোখে ত াকাতেন তিনি, একটুও বাড়াবাড়ি না করে কি বিষাদ আনতেন। একটা জায়গায় স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠ াৎ ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলতেন, তারপর চোখ মুছে আবার স্বাভাবিক হয়ে বলতেন, 'একটু চা করে আনি বিজয়দা'! পরে, যখনই 'বাকি ইতিহাস' হয়েছে, আমি উইংসের ধারে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম, অংশটা হওয়া মাত্র শরীর অবশ হয়ে আসত।

দীর্ঘদিন খুবকাছ থেকে দেখেছি 'অপরাজিতা', স্বীকার করি, প্রথম বয়সের স্পর্ধায় এই নাটকটিকে দুর্বল সাজানো মনে হত। এখন বয়স খানিক বেড়েছে— ছোটবেলার সেই পবিত্র পৃথিবী নানারকম দাঁতনোখ বার করেছে আজ আর অ াগের মত মেলোড্রামা লাগে না। আর এ নাটকের অভিনয় দেখা তো শিক্ষনীয় ব্যাপার। নাটকের আরম্ভে গভীর বিশ্বাসে অপরাজিতা বলত, 'আমি চাই আপনাদের ভাল হোক, আপনার া চান আমার ভালো হোক, আমরা প্রত্যেকেই তো প্রত্যেকের ভাল চাই।' এরপর হাসি ঠাট্টা মজায় নাটক এগোত, ক্রমে সংলাপের মধ্যে মধ্যে নীরবতার অংশ বাড়ত, গলা গভীরে নামত, নির্দোষ ঠাট্টাগুলোর মধ্যে বিদ্রুপের রূপোলী ধার লাগত। এই সমস্ত করা হত ধীরে ধীরে, প্রায় সবার অলক্ষ্যে। অসম্ভব ভাল ব্যবহার করতেন একটি পাঞ্জাবী লোকগীতি- নাটকের একেবারে শেষে অপরাজিতা যখন বেরিয়ে যাবে ঘর থেকে, লোকগীতিটি ফিরে আসত তাঁর গলায়, লম্বা লম্বা টানগুলো মনে হত আকাশ ফালাফালা করে উঠে য াচ্ছে।

কিন্তু সত্যি কি কোন মানে হচ্ছে এ লেখার ? এইভাবে পড়ে কি কিছু বোঝা যায় ? রেডিওর একটা নাটকে বুড়িমার চরিত্রে অভিনয় করছিলেন তৃপ্তি মিত্র, গরীব ছোট ছেলের বাড়ী থেকে বড়লোক বড়ছেলের বাড়িতে নিয়ে আসা হচ্ছে তাঁকে। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা বললেন, 'অবু, এই বাড়িটা তোর ?' আমি ছিলাম তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে । হ াতে নাটক সামনে মাইক তৃপ্তি মিত্রের এই ছবিটা পলকে মুছে গেল, দেখলাম এক চুল ছাঁটা বিধবা বিশাল বাড়ির সামনে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। 'সরীসৃপ' নাটকে এক বয়স্কা অভিনেত্রীর ভূমিকায় করতেন। এখন ভিখিরি সেই মহিলা বর্ণন া করেন পুরোনো দিনের কথা, যখন গিরিশ চন্দ্র ঘোষ তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। ''সাজঘরে আমাকে কে যেন বলল, আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম গিরিশবাবু।'' এই ধরনের ছিল সংলাপটা, শোনা মাত্র আমার গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে উঠল। পরে বন্ধু-বান্ধবদের এই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়েও দেখেছি, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। এর যাকে বলে নির্মাণ শৈলীর দিক অর্থাৎ গলাটা কোন পর্দায় ব্যবহার করলেন, মুখ বা চোখে কি অভিব্যক্তি আনলেন, তা মনে করবার বহু চেষ্টা করেছি, আলাদা কোন বিশেষত্ব খুঁজে পাইনি। সহজভাবে বলা একটা কথা এমন করে নাড়িয়ে দিল কি করে ? কে জানে ;

এই 'সরীসৃপ' নাটকেই তাঁর শেষ অভিনয়। তখন ক্যান্সার তাঁকে ধরে ফেলেছে। মনে পড়ে কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যু দিনে তাঁকেশ্মশানে রওনা করিয়ে ফিরছিলাম আমরা ক'জন। পথে স্বভাবতই উঠল মৃত্যুর কথা। তৃপ্তি মিত্র বললেন, অমন আচমকা মৃত্যু তাঁর পছন্দ নয়, মৃত্যুকে জানবেন, দেখবেন সে কেমন করে আসে, তবে না; আজ এই কথার পরে ভাগ্যের এক নির্মম অট্টহাসি শুনতে পাই যেন। দীর্ঘদিন ধরে পাকে পাকে জড়িয়ে নিজেকে চিনিয়ে তারপর রেহাই দিল মৃত্যু।

কিন্তু, তবুও সব জীবনকেই মৃত্যু অধিকার করতে পারে না। মারা যাবার অল্প আগে মধ্যপ্রদেশ সরকার তৃপ্তি

মিত্রের নামে কালিদাস পুরস্কার ঘোষণা করলেন। গুতর অসুস্থ তিনি , বাড়িতেই পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হল। রোগীর ঘরে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁকে সাজানো হল। শুনেছি আড়ষ্ট, বেদনাদীর্ণ শরীরে শাড়ি জড়াতেই লেগেছিল ঘন্টা দুইয়ের মত সময়। তারপর সোজা চলে গেলেন অন্য ঘরে, উজ্জ্বল মুখে পুরস্কার নিলেন, সেই হাসির ছবি উঠতে থাকল ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরায়।

অনুষ্ঠানের শেষে; অন্য ঘরে আসামাত্র নাকে লাগিয়ে দিতে হল অক্সিজেন নল। ব্যাকুল শাঁওলী প্র করলেন, 'তুমি কি করে পারলে!' তৃপ্তি মিত্র নাকি বলেছিলেন, 'তবে আর এতদিন ধরে কি শিখলাম ।' মৃত্যু তখন শিয়রে ভিখিরির মত দাঁড়িয়েছিল । মারা যাবার পরদিন খবরের কাগজে বেরোল সেদিনের অনুষ্ঠানে তোলা হাসিমুখের উজ্জ্বল ছবি । অপরাজিতার ছবি ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com